The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp.131 - 140)
Published in February, 2025

বাঙালির ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সমন্বয়বাদী ধারা

মো: আবু বকর ছিদ্দিক *

প্রতিপাদ্যসার: প্রাচীন অনার্য ধর্ম বাঙালির একটি সমৃদ্ধ ধর্ম ছিল। ৩০০-৩৫০ খ্রি. দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ এসে এর অধিকাংশ গ্রাস করে ফেলে। তারপর আসে ইসলাম। আবারও প্রচণ্ড আঘাত খায় অনার্য ধর্ম। প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে সমন্বয় খুঁজেন চৈতন্যদেব। মঙ্গল কাব্যের কবিরা অনার্য দেবদেবীর প্রশস্তি গেয়ে অনার্য যুগ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তারপর দেখা দিল সুস্পষ্ট সমন্বয়বাদী ধর্ম 'পীর নারায়ণ সত্য' ধর্ম। তারা শ্রীকৃষ্ণ ও মুহাম্মদকে(স:) একত্র করে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়ে একটি ধর্মের সৃষ্টি করতে চাইলেন। কিন্তু এ প্রয়াসও সফল হয়নি। এরপর রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার করেন। তার মৃত্যুর পর এটি হিন্দু ধর্মের একটি শাখায় পরিণত হয়। অসাম্প্রদায়িক ও সমন্বয়বাদী চেতনা নিয়ে সবশেষে লালনের আবির্ভাব। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাঙালি তার নিজস্ব আচার ও ধর্ম দ্বারা পরিচালিত। বাহির থেকে আসা ধর্মসমূহকে বাঙালি নিজের মত করে গড়ে নিয়েছে। আর্য ও আরবীয়দের মত বাঙালিরও একটি ধর্ম ছিল।

চবিশব্দ: অনার্য ধর্ম, আচার, বহিঃধর্ম, ধর্মীয় সমন্বয়বাদিতা, সংস্কার।

বঙ্গ, রাঢ়, গৌড়, সমতট, হরিকেল, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদে ঠিক কখন থেকে জনবসতি শুরু হয়েছিল তার ইতিহাস সুস্পষ্ট নয়, তবে একটি সংহত জনগোষ্ঠী যে নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার, ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তা সুস্পষ্ট। তখনকার বিশ্বাস ও আচার সাময়িকভাবে লুপ্ত হলেও আবার তা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বিংশ শতাব্দীতে এসে উপনিবেশ থেকে মুক্তির পর তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে আত্মজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ওরিয়েন্টালিজম এশিয়ার দেশসমূহে নতুন চেতনার জন্ম দেয়। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, পুরাণের নতুন তাৎপর্য, ভূ-রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ বিশ্বব্যাপী সবকিছু নতুন করে ভাববার প্রেক্ষাপট তৈরি করে। ইতিহাসবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ভাষাবিদ, ধর্মতত্ত্ববিদ প্রভৃতি গবেষকের গবেষণায় প্রাচীন বাংলার ধর্ম-দর্শন নিয়ে নতুন চিন্তার সূচনা হয় এবং একটি কাঠামোর সন্ধান পাওয়া যায়। এ অনুসন্ধান জাতির মনে নিজস্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে গৌরববোধ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। নিজ জাতিসত্তা সম্পর্কে এ ধারণা জাতীয় সংহতির সারবস্তু।

প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে লিখিত কোন ইতিহাস পাওয়া যায়নি কিন্তু প্রত্নপ্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহৃত আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলার বহু স্থানে। সুনীতি ভূষণ কানুনগো বলেন,

> বাংলায় দ্রাবিড় ও আর্যসংস্কৃতি বিস্তারের পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিকযুগের নিদর্শন গাঙ্গেয় বদ্বীপের নিম্নাঞ্চল ছাড়া বাংলার প্রায় সর্বত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের অজয়, দামোদর, কাঁসাই (কংসাবতী), শিলাই (শিলাবতী), সুবর্ণরেখা, ভাগীরথী ইত্যাদি নদনদীর অববাহিকায় খননকার্যের ফলে প্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন প্রকারের বস্তুসামগ্রীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলের সানুদেশে, ময়নামতি-লালমাই এর উচ্চভূমিতে, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ের পাদদেশে, শীতলক্ষ্যা নদীর অববাহিকায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তর ও ধাতুপ্রস্তর যুগের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। (সুনীতি ১৫)

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলার মাটি উর্বর। নব্যপ্রস্তর যুগের কৃষি সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল এখানে। এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, ভোটচীনীয় জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংকর বাঙালি জাতি। তাদের নিজস্ব ধর্ম, আচার ও সংস্কৃতি ছিল। বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলামের আগমনের পর এ জীবনাচারমূলক আবহমান সনাতন ধর্মটি চাপা পড়ে যায়। এর অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম কর্তৃক আত্মীকরণ হয়। বাকিটা অবহেলায়, অনাদরে ক্ষয় হতে থাকে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলায় ধর্মেরও পালাবদল হতে থাকে। কিন্তু বাঙালি জাতিসত্তার জন্য তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ সাধন হিতকর। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এরূপ অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়। এছাড়া বাঙালির আচরণ চিরকালই ছিল সমন্বয়বাদী। এ অন্বেষণও সাম্প্রদায়িক বৈরীতার বিপরীতে সহনশীল আচরণের প্রেরণা দিতে পারে। বাংলার আদি ধর্ম, আগত ধর্ম ও দুয়ের সমন্বয় ধারা বর্তমান প্রবন্ধের পর্যালোচনার বিষয়।

অনার্য ধর্ম

প্রত্যেক সমৃদ্ধ জাতি তিনটি যুগ অতিক্রম করে আধুনিতায় পৌঁছেছে, বলে অভিমত দেন ফ্রেজার; 'জাদুবিদ্যা-ধর্ম-বিজ্ঞান।' (হাসান ২০০৩, ৫৫) মর্গান সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলেন, 'প্রত্যেক সভ্য জাতির তিনটি পর্যায় রয়েছেঃ বন্যদশা (Savagery), বর্বরদশা (Barbarism), সভ্যদশা (Civilization)।' (Morgan 1877, 12) বন্য ও বর্বরদশায় মূলত জাদুবিশ্বাস ও পৌরাণিক ধর্মসমূহের প্রচলন ছিল। বাঙালিকে অবশ্যই আজকের অবস্থানে আসতে এ সকল অতীত পার হতে হয়েছে। তার অসংখ্য নিদর্শন আজও নামে বেনামে টিকে আছে। অসংলগ্ন অবস্থায় বাংলার প্রাক আর্য যুগের ধর্মীয় আচারের যে কয়টি নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলো হলঃ গ্রাম-দেবতা, গাছপূজা, যাত্রা, ব্রতোৎসব, ধর্মঠাকুর, চড়কপূজা, হোলী, মনসাপূজা, জাঙ্গুলী, ঘটলক্ষ্মীরপূজা, ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি। জন্মান্তরবাদ ছিল তাদের ধর্ম দর্শনের মূল ভিত্তি। বাঙালি জাতির উৎস আদিম গোষ্ঠীসমূহ কোন এক কেন্দ্রিক শাসন কিংবা একই আচারের অধীন ছিল না। একেক অঞ্চলে একেক টোটেম ও সেজন্য নানারকম টাবু প্রচলিত ছিল। তাই ভিন্ন ভিন্ন জীবনাচার, পূজা-পার্বণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এসবের কোন লিখিত গ্রন্থ না থাকায় এর অধিকাংশই আজ বড় বড় ধর্মসমূহ আত্মীকরণ করে ফেলেছে। একটু পরীক্ষানিরীক্ষা করলেই এগুলোর সাথে বাঙালির আদি ধর্মের সংযোগ সূত্র বেরিয়ে আসে। অনেক বাঙালি গবেষক তা প্রমাণ করেছেন।

জন্মান্তরবাদ

মৃত্যুর পর মানুষ আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে এ ছিল প্রাচীন অনার্য ধর্মসমূহের বিশ্বাসের ভিত্তি। মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণী হয়েও ফিরে আসতে পারে। পরকাল, স্বর্গ, নরক এসকল ধারণা আদি বাংলার ধর্মে ছিল না। হিন্দু ও বৌদ্ধের জন্মান্তরবাদ এ প্রাক আর্য ধারণা থেকে আহরিত। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে,

> হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক ইত্যাদি সমস্তই আমাদেরই প্রতিবাসীর এবং আমাদের অনেকেরই রক্তস্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের দান। (রায় ৪৭৮)

এই আদিবাসী হল বাঙালির উৎস আদিম নৃগোষ্ঠীসমূহ।

গ্রাম-দেবতা

প্রাচীন অনার্য সমাজ ছিল গ্রাম সভ্যতার সমাজ। তারা প্রত্যেকটি গ্রামের জন্য একজন করে দেবতা কল্পনা করতো। দেবতা গ্রাম পাহারা দিতো। দেবতার জন্য মান্নত করতো তারা। নীহাররঞ্জন বলেন,

> 'গ্রাম দেবতা' সর্বত্র একই নামে বা একই রূপে পরিচিত নহেন; সাম্প্রতিক বাঙলায় কোথাও তিনি কালী, কোথাও ভৈরব বা ভৈরবী, কোথাও বনদুর্গা বা চণ্ডী, কোথাও বা অন্য কোনও স্থানীয় নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, পুরুষ বা প্রকৃতি-তন্ত্রেরই হউন, সংশয় নাই যে, সর্বত্রই তিনি প্রাক্-আর্য আদিম গ্রামগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা।' (রায় ৪৮১)

ধ্বজা পূজা

ধ্বজা পূজা প্রাচীন অনার্য বাঙালিদের পূজা। যদিও হিন্দু ধর্ম পরবর্তীতে তা আত্মীকরণ করেছে। এর নিদর্শন আজও বাংলার প্রান্তিক শ্রেণির মধ্যে পাওয়া যায়। নীহাররঞ্জনের অভিমত,

> সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে কোনও ধর্মকর্ম ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজা ছাড়া অনুষ্ঠিতই হয় না প্রায় বলা চলে। (রায় ৪৮২)

গাছপূজা

প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজের মানুষ প্রকৃতির পূজা করতো। তারা ছিল প্রকৃতির কোলে অসহায়। ঝড়, বন্যা, খড়া প্রভৃতি থেকে গাছ তাদের রক্ষা করতো। আবার গাছের ফলমূল ও শস্য খেয়ে তারা জীবন ধারণ করতো। অসুখ হলেও ওষধি গাছ ছিল তাদের আশ্রয়। সেজন্য গাছপালার প্রতি তাদের ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা ছিল অতি নিবিড়। তাই সেগুলিকে তারা দেবত্ব আরোপ করে পূজা করতো। নীহাররঞ্জন বলেন,

> বাঙলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে, গাছপূজা এখনো বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে তুলসী গাছ, সেওড়া গাছ ও বটগাছ।.... এ-সমস্তই সেই আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে। (রায় ৪৭৯)

গাছকে শাড়ি ও সিঁদুর পরিয়ে নারী রূপে কল্পনা করে এসব পূজা হয়ে থাকে। প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সংস্কার আজও নিবু নিবু অবস্থায় টিকে আছে। দেবব্রত নস্কর বলেন, 'বট-অশ্বত্থ-শিব, নিম-পঞ্চানন্দ, বেল-ব্রহ্মাদিত্য, সিজবৃক্ষ-মনসা, কদম-রাধাকৃষ্ণ, তুলসী-নারায়ণ, ধান-গম-যব ইত্যাদিতে লক্ষ্মীর অবস্থান বলে মনে করা হয়।' (নস্কর ৫২)

যাত্রা

হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠানে ঢুকে পড়া আদিবাসী অনুষ্ঠান হল যাত্রা। আজ তা হিন্দুর সম্পত্তি হলেও এর মূল অনার্য সমাজে নিহিত।

> ধ্বজা বা কেতনপূজার মত নানাপ্রকারের যাত্রাও বাঙলার আদিবাসী কোমগুলির অন্যতম প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য করা হইত। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসব মূলত তাঁহাদেরই; পরে ক্রমশ ইহাদের আর্যীকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে। (রায় ৪৮৩)

ব্রতোৎসব

সারা বছরব্যাপী জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনার পূর্বে বাঙালি নারীরা ব্রতপালন করতো। সেঁজুতি ব্রত, ভাদুরি ব্রত, বসুন্ধরা ব্রত, ধানগোছানো ব্রত প্রভৃতি। বাঙালি ব্রত পালন করতো বলে আর্যরা তাদের ব্রাত্য বা পতিত বলে গাল দিত। 'এই ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় হইতেই সুপ্রচলিত ছিল এ-সম্বন্ধে সংশয় বোধ হয় নাই।' (রায় ৪৮৩)

ধর্মঠাকুর

ধর্মঠাকুরের আসল প্রতীক পাদুকা চিহ্ন। ধর্মপূজার পুরোহিতেরা ঠাকুরের গলায় ঝুলিয়ে রাখেন এক খণ্ড পাদুকা বা পাদুকার মালা। 'ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক্-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা।' (রায় ৪৮৬) ধর্মঠাকুর গ্রস্ত হন বৌদ্ধ ও হিন্দু, দুই ধর্ম কর্তৃক। দেবব্রত নস্কর বলেন, 'বাংলার বিশিষ্ট লোকদেবতা ধর্মঠাকুর।' (নস্কর ২১)

চড়কপূজা

কুমীরের পূজা, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর ছোলা কাঁটা ও ছুরির উপরে ঝাঁপ, বাণফোঁড়া, শিবের বিবাহ ও অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছ হতে দোলা ইত্যাদি এ পূজার অঙ্গ। 'সামাজিক জনতত্ত্বের দৃষ্টিতে ধর্ম ও চড়ক-পূজা দুইই আদিম কোম সমাজের ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।' (রায় ৪৮৭)

হোলী বা হোলাক উৎসব

বাংলাদেশে ফাল্গুনী শক্লা চতুর্দশী বা পূর্ণিমা তিথিতে হোলী উৎসব হয়। এ যুগে এসে রাধা-কৃষ্ণ কাহিনি প্রযুক্ত হয়েছে। 'এ-তথ্য এখন অনেকটা পরিষ্কার যে, আদিতে হোলী ছিল কৃষিসমাজের পূজা; সুশস্য উৎপাদন-কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব ছিল তাহার প্রধান অঙ্গ।' (রায় ৪৮৭)

মনসাপূজা

বাংলায় অসংখ্য নদীনালা বিল ঝিল থাকায় এখানে সাপের প্রাদুর্ভাব বেশি। সাপের ভয় থেকেই মনসা পূজার উদ্ভব হতে পারে। অথবা 'সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক এবং মূলত কৌম সমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা-পূজার উদ্ভব, এ-তথ্য নিঃসন্দেহ।' (রায় ৪৮৯) সাপ যে গোত্রের টোটেম ছিল সে গোত্রে এর পূজা প্রচলিত হতে পারে। কারণ প্রথম দিকে বন্য সমাজে জাদুবিশ্বাস ও টোটেমকে ধর্মের মতই মানা হতো। পরে এ সকল গোত্রে দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হয়। সাপের পূজা নৃগোষ্ঠী সমাজে সাপের ভয় থেকে উদ্ভব হয় বলে মনে করেন দেবব্রত নস্কর। বর্বর যুগে এতে মানবীয় গুণ আরোপ করার জন্য মনসা দেবীর সংযোগ হয়। তিনি বলেন, 'সর্পপূজা এমনই এক বিশ্বাসজাত পূজাচার যা আদি নৃ-গোষ্ঠীর ভয়ভীতি জাত বলেই বিবেচিত হয়, এবং অদ্যাপি সজীব সংস্কৃতিরূপে মান্যতা পায়।' (নস্কর ১১০)

ঘটলক্ষ্মীর পূজা

লক্ষ্মী বাংলার শস্যের দেবী। লক্ষ্মীপূজা কেবল হিন্দু সমাজ আত্মীকরণ করলেও মুসলমান হিন্দু উভয় সমাজের মানুষ কথায় কথায় লক্ষ্মীর নাম নেয়। লক্ষ্মীছেলে, লক্ষ্মীমেয়ে, লক্ষ্মী জামাই, লক্ষ্মী বউ, অলক্ষ্মী কোথাকার, লক্ষ্মীছাড়া প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার প্রমাণ করে এক কালে বাঙালি সমাজে এর প্রভাব কেমন ছিল। 'এই লক্ষ্মী কৃষিসমাজের মানস-কল্পনার সৃষ্টি; শস্য-প্রাচুর্য্যের এবং সমৃদ্ধির তিনি দেবী।' (রায় ৪৯১) ব্রাহ্মণ্যবাদ জনপ্রিয় অনার্য দেবদেবীগুলোকে নিয়ে বেশি রকম বাড়াবাড়ি করেছে যেন তাদের অনার্য পরিচয় মুছে যায়। লক্ষ্মীর ব্যাপারেও অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু লক্ষ্মীর মৌলিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছেন নীহাররঞ্জন রায়। দেবব্রত নস্করও বলেন, 'দেবী লক্ষ্মীর পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনি পর্যালোচনা ও মূর্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণে জানা যায় লক্ষ্মীপূজা আদি নৃ-গোষ্ঠীর প্রকৃতি পূজার অঙ্গ।' (নস্কর ১১৭)

ষষ্ঠীপূজা

সন্তান কামনায় ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই পূজা বর্তমানে হিন্দু সমাজে পালিত হয়ে থাকে। তবে 'ষষ্ঠীদেবীর কোনও প্রতিমা পূজার প্রচলন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নাই।' (রায় ৪৯১) সুতরাং এ পূজা প্রাক আর্য ধর্ম বিশ্বাস থেকে এসেছে। অনার্য ধর্ম ছিল জীবন ঘনিষ্ঠ। এর কোন লিখিত অনুশাসন ছিল না। চর্চার মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত ও প্রবহমান ছিল। মানবিক দিক তাই সে ধর্মে ছিল প্রবল। এতকাল বাঙালির দেবদেবীসমূহ হিন্দু ধর্মের দেবদেবী হিসেবে পরিচিত

ছিল। নানা গবেষকের গবেষণায় এর মূল পরিচয় বেরিয়ে এসেছে। ধর্মীয় জীবনে বাঙালি যে অনেক সমৃদ্ধ ছিল এসব দেবদেবী তার প্রমাণ। এ কথা সুস্পষ্ট যে প্রাক-আর্য যুগে বাঙালির একটি অলিখিত, আচার প্রধান, সমৃদ্ধ ধর্ম ছিল। হিন্দুদের দ্বারা গ্রস্ত হবার পর বাঙালির ধর্মীয় ঐতিহ্য মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে সুযোগ পেলেই নিজের অস্তিত্বের খবর জানিয়ে দিতে ভোলেনি।

যোগ-সাংখ্য-তন্ত্র দর্শন

বাঙালির ধর্মীয় চিন্তার গভীরতার প্রমাণ তাদের দর্শনসমূহ। যোগ, সাংখ্য, তন্ত্র বাংলার মৌলিক দর্শন। এ দর্শনসমূহ অত্যন্ত মানবতাবাদী। এ সকল দর্শন ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আত্মশুদ্ধি অর্জন ছিল এগুলোর মূল লক্ষ্য। কোন প্রকার পোশাকি রূপ বা রাজনৈতিক রূপ ছিল না এদের। আধুনিক যুগে ধর্মকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত রাখার যে প্রচেষ্টা চলছে তা ওই ধর্মগুলোতে ছিল স্বাভাবিক।

> যোগ ও সাংখ্য-এ দুটো অতি পুরানো অনার্য দর্শন। পুরুষ (চৈতন্যস্বরূপ) ও প্রকৃতি (উপাদান) তত্ত্বই সাংখ্য দর্শনের ভিত্তি। আর দেহচর্যার দ্বারা আত্মোপলব্ধির পদ্ধতির নাম যোগ শাস্ত্র। .... 'তন্ত্র' বলে অপর একটি অনার্য-শাস্ত্রও যোগ এবং সাংখ্যতত্ত্বের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একটি জটিলতর মিশ্র তত্ত্বের উদ্ভব ঘটায়।' (হাই ও শরীফ ভূমিকা ড)

পরবর্তীকালে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবে বাঙালি বাহ্যিকভাবে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম হয়েছে বটে, তাদের অন্তরে রয়ে গেছে সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র মন্ত্র।

বর্তমানে বহুল চর্চিত ধর্মগুলোর আগমন ও প্রচার

যে বড় ধর্মগুলো বর্তমানে বাঙলির চিন্তাজগৎ ও অন্তরজগৎ শাসন করছে তার সবকটি বাংলার বাইরে থেকে এসেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ উত্তর ভারত, ইসলাম ধর্ম আরব ও খ্রিষ্টান ধর্ম ইউরোপ থেকে বাংলায় এসেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের আগমন ৩০০-৩৫০ খ্রিঃ। নীহাররঞ্জন বলেন, 'বিশেষ ভাবে গুপ্ত আমলে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশ বাঙলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে।.... বাংলায় গুপ্তাধিপত্য-আঃ ৩০০-৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ।' (রায় ৩৫৯) বাংলায় ইসলাম ধর্মের আগমন ১২০৪ খ্রিঃ এবং খ্রিষ্টান ধর্মের আগমন ১৭৫৭ খ্রিঃ (রাজনৈতিকভাবে)।

রাজশক্তির কারণেই হোক, অন্য কোন কারণেই হোক বাঙালি অনার্যদের ধর্ম চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু বাঙালি জীবন চর্চায় এর প্রভাব অত্যাধিক। ভিন্ন সংস্কৃতিতে উৎপন্ন উপর্যুক্ত ধর্মগুলো বাঙলার পরিবেশের সাথে যথাযথ মিলেনি। তাই বাঙালি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম ধর্ম মেনে নিলেও তাকে নিজের মত করে গড়ে নিয়েছে। এগুলোর একটা বাঙালি রূপ অতি স্পষ্ট। আহমদ শরীফ বলেন,

> বাঙালীর জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম গ্রহণের এবং গ্রহণ করেও আন্তরিকভাবে বরণ না করার রহস্য এবং জৈব-জীবনের তাগিদে তাকে প্রয়োজন মতো রূপ দেবার তত্ত্ব এখানেই নিহিত। (শরীফ-১, ০৫)

পরবর্তীতে যে সমস্ত বাঙালি মহাপুরুষ নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন তারা তাদের ধর্মকে ওগুলোর মত ব্যাপকতা দিতে পারেননি। তাই তাদের প্রচেষ্টা ছিল উপর্যুক্ত ধর্মগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন। তারা বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি ও মননের সাথে মিলে, এমন একটি রূপ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেন। চৈতন্য থেকে লালন পর্যন্ত সবাই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় খুঁজেছেন।

বৈষ্ণব ধর্ম

ইসলাম আসার পর ব্রাহ্মণ্যবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য কমে যায়। বাঙালি চিন্তাবিদেরা নতুন একটি মতের সাথে সাক্ষাৎ পরিচিতি পেল। শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) হিন্দু ও ইসলাম এ দুটি ধর্মের একটি সমন্বয় তত্ত্ব নিয়ে আবির্ভূত হন। 'হিন্দুর মায়াবাদ ও মুসলমানের সূফীতত্ত্বের সমন্বয়ে নবদর্শন আবিষ্কৃত হল, অর্থাৎ নতুন ধর্ম সৃষ্টি হল।' (শরীফ-২, ১০) তত্ত্বগত বিচারে দুটি মতই কাছাকাছি। সুতরাং বাংলায় হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সর্ব প্রথম আপোষমুখী চিন্তাবিদ শ্রী চৈতন্যদেব।

আদিকালে বাঙালি জাতি অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীনীয়, মঙ্গোলীয় জাতির রক্তগত সংমিশ্রণকে যেমন উদারভাবে মেনে নিয়েছিল তেমনি মেনে নিয়েছিল পরস্পরের বিশ্বাস অবিশ্বাসকেও। তাই সমন্বয় বাঙালির জাতিগত ধর্ম। হিন্দু ও ইসলাম এ দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মাঝেও সমন্বয় খুঁজে পেলেন চৈতন্যদেব। বাঙালি পরমত সহিষ্ণু বলে সহজে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করল আবার একাংশ ছেড়েও দিল সহজে। চৈতন্যদেব যখন সমন্বয় বাণী শোনালেন, হিন্দু মন্দির ছাড়ল, মুসলমান আর তেমনভাবে মসজিদে গেল না। একটি মধ্যপন্থার সৃষ্টি হল। 'ইসলাম সত্য সত্যই বড় বাধা পেল। এর গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল। ইসলাম আর বিশেষ প্রচার বা প্রসার লাভ করল না।' (শরীফ-২, ১০)

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করেই বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব। হিন্দু ধর্মে শ্রেণি বিভাজন, শাস্ত্রে অনধিকার, পূজাঅর্চনায় ব্যয় বহুলতা, ব্রাহ্মণদের নিপীড়ন, ভাষাগত দুর্বোধ্যতা, ধর্মগত বিধি নিষেধের অযথা কড়াকড়ি সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে চৈতন্যের আহ্বান ছিল সহজিয়া। কোন গ্রন্থ নেই, আচার নেই, ইবাদত বন্দেগির কোন বিধিমালা নেই, ঠাকুর নেই, মোল্লা নেই, মসজিদ মন্দিরে যাবার প্রয়োজনীয়তা নেই, শোষণ নির্যাতন নেই, বড় ছোট নেই, শুধু নাম জপলেই মুক্তি। এমন একটি সহজ ধর্মের প্রতি বাঙালি সহজেই ঝুঁকে পড়ে। বাঙালি এতে তার মূলের সন্ধান পায়। কৌম মানুষ নিজেদের কল্যাণের জন্যই একদিন দেবদেবীর সৃষ্টি করেছিল। অনার্য ধর্মের মূলকথা ও অনুভূতি ছিল মানব মুক্তি, বৈষ্ণবেও তাই। বৈষ্ণব মত অনুসারে মানুষও ভগবানের সম্পর্কটা সংক্ষেপে এই,

> আদিতে পরমপুরুষ স্বরূপ বিধাতা এক ছিলেন। তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করলেন, তাই নিজ অংশ থেকে নারী স্বরূপাকে সৃষ্টি করে 'যুগল' হলেন। এখানেই পুরুষ-প্রকৃতি মায়াব্রহ্ম ও বিষ্ণুশ্রী তত্ত্বের উদ্ভব। নারীই শক্তি স্বরূপা, নারীসম্পর্কেই পুরুষ হয় শক্তিমান। মৈথুন তত্ত্বেরও উদ্ভব হয় এভাবেই। পুরুষ-প্রকৃতির তথা নারীপুরুষের মিলনেই সৃষ্টির উদ্ভব। তাঁদের সম্পর্কও প্রেমের। কাজেই সৃষ্টি প্রেমজ। তিনি চাইলেন-একোহম বহুস্যাম। কেননা আমি নিজেকে বিচিত্রভাবে উপভোগ করতে চাই। আর তাই সৃষ্টি স্রষ্টার আনন্দসহচর। যেখানে স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের আনন্দের তথা প্রণয়ের সম্পর্ক সেখানে নিয়মরীতির ব্যবধান থাকতে পারে না। কাজেই আনুষ্ঠানিক ধর্মের সেখানে ঠাঁই নেই। অনুরাগে প্রেমের উন্মেষ, বিরহবোধে এর উপলব্ধি এবং মিলনে এর সার্থকতা। বৈষ্ণবের কথায় এ মিলন মানে যুগলরূপ ও অভেদরূপ। (শরীফ-২, ২১)

সৃষ্টি যেমন স্রষ্টাকে পেতে সাধনা করে তেমনি স্রষ্টাও সৃষ্টিকে পেতে চায়। সুতরাং এখানে স্বর্গ, নরক, বেহেস্ত, দোযখের কোন বালাই নেই। স্রষ্টার কীর্তন বা নাম জপই হল এর মূল এবাদত বা পূজা। চণ্ডীদাস বলেন,

না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ।। (হাই ও শরীফ, ৩৬)

বৈষ্ণব ধর্ম অসাম্প্রদায়িক হলেও ইসলাম কিংবা হিন্দু ধর্মের মতো ব্যাপক প্রসার লাভ করতে পারেনি। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তা হিন্দু ধর্ম কর্তৃক গ্রস্ত হয়ে পড়ে।

অনার্য ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন চেষ্টা

চৈতন্যদেবের পরবর্তী সময়ে প্রাচীন বাংলার অনার্য ধর্মের উত্থানের একটি প্রচেষ্টা চলে। চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি অনার্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক কাব্য রচনা করে তাদের পূজা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা দেখা দেয়। অনার্য নিষাদ জাতির প্রতিনিধি কালকেতু, ফুল্লরা, পূর্ববঙ্গের নদীবহুল এলাকার প্রতিনিধি বেহুলা, লক্ষ্মীন্দর, বণিক সমাজের প্রতিনিধি ভাঁড়ুদত্ত, ধনপতি, খুল্লনা, লহনা, শ্রীমন্ত প্রভৃতি। বিদেশি শাসকদের শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার, অবিচারে অতিষ্ঠ মানুষ নিরুপায় হয়ে প্রাচীন অনার্য দেবদেবীর শরণাপন্ন হয়। মাহমুদ শরীফ নামে ডিহিদারের উৎপীড়নের ফলে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে বাস্তুত্যাগ করতে হয়। কবি উড়িষ্যায় আশ্রয় নেন। ১৫৪৪ খ্রি. চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয় বলে ধারণা করা হয়। ভারতচন্দ্রের (১৭০৭-১৭৬০) সৃষ্টির মূলেও প্রেরণা যুগিয়েছে একই চিত্র। আহমদ শরীফ বলেন,

> ভারতচন্দ্রের কালে যে তা-ই ঘটেছিল- বিশেষ করে মানুষ যে অর্থাভাবে তথা অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছিল, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ কবি স্বয়ং ছিলেন দারিদ্র্যক্লিষ্ট- অন্নাভাবগ্রস্থ। তা-ই তাঁর ইষ্টদেবতা কালী গৌরী তারা দুর্গা চণ্ডী নন- অন্নদায়িনী অন্নদা অন্নপূর্ণা।' (শরীফ-২, ৪১৫)

মনসামঙ্গল অন্যায় অত্যাচরের বিরুদ্ধে বাঙালির বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয়। তুর্কিদের সাথে সম্মুখ দ্বন্দ্বে দাঁড়ানোর মত ক্ষমতা তখন বাঙালির ছিল না। কিন্তু অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিছু একটা করা দরকার। বাঙালি কবিরা তখন পুরাণের আশ্রয় নিলেন। পুরাণকে তারা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আহমদ শরীফের অভিমত:

> একেশ্বরবাদী আত্মপ্রত্যয়ী পরাক্রান্ত তুর্কীদের সঙ্গে পরিচয় মুহূর্তের প্রথম অভিঘাতে শাসক-শাসিতের মানসদ্বন্দ্বের ও মিলনের সন্ধিক্ষণে ক্ষণপ্রভার মতো দেশী লোকের মানসে আত্মশক্তির ও আত্মমর্যাদার যে-চেতনা জাগে, চাঁদ-বেহুলার বিদ্রোহে ও দৃঢ়সংকল্পে তা-ই বিস্ময়কর ঋজুতায়, দৃঢ়তায় ও উজ্জ্বলতায় অভিব্যক্ত।' (শরীফ-২, ৪০১)

কিন্তু এ অভ্যুত্থান চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। মঙ্গলধর্ম আলাদা কোন কাঠামো গঠন করতে পারেনি কারণ ততদিনে এ দেবদেবীগুলো হিন্দুদের নিজেস্ব সম্পত্তি বলে ধারণা জন্মে যায় জনমনে। মুসলমানেরা তা থেকে রস আস্বাদন করেছে বটে বিশ্বাস করেনি।

সত্য ধর্ম

হিন্দু-মুসলিম সম্মিলনের পরবর্তী প্রচেষ্টা 'পীর-নারায়ণ সত্যধর্ম'এর উদ্ভব। এতে হিন্দু মুসলিম দেবতা ও প্রচারকের সমন্বিত মূর্তি কল্পনা করে দুটো ধর্মকে এক করে ফেলার চেষ্টা চলে। বাংলার অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে আরও এক ধাপ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এ ধর্ম। তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিতে হিন্দু মুসলিম দুই ধর্মের উপরই মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে। আহমদ শরীফ বলেন,

> ১৫৩৮ সনে শেরশাহর বঙ্গবিজয়, সম্রাট ইসলাম সুরের মৃত্যুতে বাঙলায় প্রশাসনিক কোন্দল ও বিশৃঙ্খলা, ১৫৫৪ থেকে ১৫৭৫ সন অবধি ঘন ঘন শাসকবদল ও যুদ্ধবিগ্রহ, মুঘলবিজয়ের পরে বিয়াল্লিশ বছর ধরে সামন্ত-সম্রাটের দ্বান্দ্বিক অবস্থান ও তজ্জাত নৈরাজ্য আর য়ুরোপীয় বেনেদের নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতির প্রভাব, মঘ-হার্মাদের

> নদীপথে লুটতরাজ এবং মুঘলদের সাম্রাজ্যিক শোষণ প্রভৃতি জনজীবন দুর্বহ করে তুলেছিল।....জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত মানুষ পুরোনো শাস্ত্রে ও নীতিআদর্শে আস্থা হারিয়ে বিশ্বাসের নতুন বন্দরে নোঙর ফেলে আশ্বস্ত হতে চায়, এ মনোভাব থেকেই ষোল শতকের শেষ পাদের ও সতেরো শতকের শোষিত পীড়িত উদ্বিগ্ন মানুষ উদ্ভাবন করে নির্জিত দুস্থ মানুষের এক মিলনমন্ত্র- সে মন্ত্র হচ্ছে 'সত্য'। (শরীফ-২, ৪৩৯)

দুর্বিষহ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে মানুষ সত্যের সন্ধান শুরু করে। দুর্বল ও অসহায়ের কেউ নেই, কেবল সত্যই পারে তাদের পরিত্রাণ দিতে। ধর্মীয় বিভেদ ভুলে তারা আপোসের পথ খুঁজেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল বৈষয়িক সমৃদ্ধি। আহমদ শরীফের অভিমত,

> একদিন স্বস্তিতে ভাতে কাপড়ে বাঁচবার আগ্রহে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত নির্জিত বিপন্ন দীন দুঃখী হিন্দু-মুসলিম বাঙালী 'সত্য' নামের ভেলায় চড়ে বসেছিল, সেদিন ভিন্ন অবয়বের শাস্ত্রের ও মানবসত্যের অভিন্নতা অবলীলায় স্বীকৃত হয়েছিল-সেদিন নবী-কৃষ্ণও অভিন্ন কোন আত্মা নন কেবল, অভিন্ন কায়ও ছিলেন।' (শরীফ-২, ৪৩৯)

ইসলাম ও সনাতন ধর্মের মধ্যে তারা যে মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন তা কেবল মৈখিক নয়, তাত্ত্বিক। ধর্মীয় বিভেদকে তারা মানবসত্তার ঊর্ধে একটি আদর্শ সত্তায় উন্নীত করেছিলেন। ধর্ম প্রচারকদের ভিন্নতার জন্যই ধর্মে ধর্মে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। সকল ধর্মের মূল কথা একই; সত্যকে মান্য করা। তাই বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রচারকদের মধ্যে তারা অন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। এতে নবী মুহাম্মদ (সা:) ও শ্রীকৃষ্ণ এক দেহধারী। কবি কৃষ্ণরাম দাস *রায়মঙ্গল* কাব্যে বলেন,

অর্ধেক মাথা কালা একভাগে চুড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি তাতে।
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাতে।।
(শরীফ-২, ৪৩৯)

সে সময় সত্য নারায়ণের পাঁচালি বেশ জনপ্রিয় ছিল। সত্যনারায়ণ পাঁচালীতেও স্বীকার করা হয়েছে যে, 'বিষ্ণু আর বিসমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।' (শরীফ-২, ৪৩৯) কোরানও সত্য, পুরাণও সত্য। সুতরাং সত্য বলার ব্যাপারে দুটি এক হলে, বিভেদের দরকার কি, এক সত্যকে মানাই ভাল। সত্য মুসলমানদের কাছে পীর, হিন্দুদের কাছে নারায়ণ। সত্য ধর্মের প্রথম পাঁচালীকার শেখ ফয়জুল্লাহ। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি *সত্যপীর বিজয়* পাঁচালী রচনা করেন।

সত্য ধর্মের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সফল হলে মধ্যযুগে বাঙালি এক বিস্ময়কর ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারতো। ব্যর্থ হলেও এর প্রভাব বাঙালি মানসে সুদূর প্রসারী ছিল।

ব্রাহ্ম ধর্ম

১৭৫৭ সালে রাজনৈতিকভাবে ইংরেজের আগমন ঘটে বাংলায়। ইংরেজরা অপার্থিবতার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিল পার্থিব জীবনকে। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের অসারতা প্রমাণের জন্য তারা যুক্তিবাদের প্রচলন করল। বাংলায় ইয়াংবেঙ্গল নামে নতুন একটি জেনারেশন যুক্তিবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। এ সময় হিন্দু, ইসলাম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ও যুক্তিবাদের সমন্বয়ে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তন করেন। ঋষি দাস বলেন,

> রাজা রামমোহন রায়ের মতে, সকল ধর্মের মূলকথা একেশ্বরবাদ, সকল ধর্মের মূলকথা এক, ধর্মে ধর্মে পার্থক্য ও বিভেদ কতিপয় স্বার্থান্বেষীর সৃষ্টি, অন্ধবিশ্বাস ধর্ম নয়, তিনি সকল ধর্মমতকে যুক্তি দ্বারা বিচার করে দেখার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। (দাস ২৪)

রামমোহন নব্য শিক্ষিত ও নব্য ধনী শ্রেণীকে বেশ প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। 'আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁকে বলেছিলেন, Prophet of humanity; মানবতার প্রবক্তা।' (দাস ১) কিন্তু সাধারণ মানুষের কানে তাঁর বাণী পৌঁছায়নি। সত্য ধর্মের সমন্বয় ছিল হিন্দু ও ইসলাম, দুটি ধর্মের মধ্যে। ব্রাহ্ম ধর্মে খ্রিষ্টান ও যুক্তিবাদ অতিরিক্ত যোগ হয়। এতে সমন্বয়বাদী ধারা আরও গতি লাভ করল।

রামমোহনের একেশ্বরবাদ রসভাষ্যে প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্ম ধর্ম বাংলায় সার্বজনীন রূপ পায়নি। কারণ রামমোহনকে অন্যান্য সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মের সংস্কারক বলে একপাশে ঠেলে দিল। 'রাজা রামমোহন রায়ের নামমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাখানুসারী বলে মনে করে। ফলত, এরা জাতিতে হিন্দুই রয়ে গেল।' (শরীফ-২, ১০)

বাউল দর্শন

রামমোহনের পর নিজের পরিচয় লুপ্ত করে দিয়ে বাঙালির মৌলিক ধর্মকে জাগাতে চাইলেন ফকির লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯৪)। উল্লেখ্য যে, রামমোহন রায় ও লালন শাহের জন্ম একই বৎসরে হলেও রামমোহনের ধর্ম ও দর্শন প্রকাশ পায় আগে এবং রামমোহন ১৮৩৩ সালে মারা যান। লালন দীর্ঘজীবী হন এবং রামমোহনের মৃত্যুর পর আরো ৬০ বছর তিনি তার দর্শন প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করেন। তাই লালনকে রামমোহনের পরবর্তী ধরা যায়। লালন তার জন্ম পরিচয় কাউকে জানতে দেননি নিজেকে প্রচলিত ধর্মমতের উর্ধে রাখার জন্য। লালন চৈতন্যদেবের মত অদ্বৈতবাদী ছিলেন। স্রষ্টার আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি মানুষের মাঝে যুগে যুগে বিরাজমান। তার দর্শনে, প্রকারান্তরে মানুষই ঈশ্বর।

> জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার স্থিতি। কাজেই আপনার আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরিচয়ই খোদা প্রাপ্তির উপায়, তাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাই বাউলদের ব্রত।.... বাউলের রূপক অভিব্যক্তিতে সে-পরমাত্মা হচ্ছেন-মনের মানুষ, অটল মানুষ, অধর মানুষ, মানুষ রতন, মনমনুরা, অচিন পাখী ও অলখসাঁই (অলক্ষ্য স্বামী)। (হাই ও শরীফ ভূমিকা ঢ)

বাউলেরা দেহের মধ্যে ঈশ্বরকে সাধনা করেন। দেহই তাদের মসজিদ, মন্দির বা খোদা ও ঈশ্বরের ঘর। দেহের বাইরে কিছু নেই। তাদের কাছে দেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আত্মা দেহ থেকে বের হয়ে পরমাত্মার সাথে মিলিত হয় আবার দেহ ধারণ করে মানুষ হয়। তাই ঈশ্বর ও মানুষ ভিন্ন নয়। যেমন, এক কলসি জল ও এক সাগর জল; দুটোই জল। লালন বলেন,

নদী কিংবা বিল, বাঁওড়, খাল-
সর্বতরে একই সে জল।
একা মোর সাঁই
আছে সর্ব ঠাঁই,
মানুষে মিশে সে হয় রূপান্তর। (ভট্টাচার্য ৫৯০)

মানুষকে ভজনা করলেই ঈশ্বরকে ভজনা করা হয়। লালন বলেন, 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি / মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি।' (ভট্টাচার্য ৬৬৮)

মানুষের মধ্যে যদি সাঁই (সৃষ্টিকর্তা) বসবাস করেন তবে হিন্দু-মুসলিম, ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ শিথিল হয়ে পড়ে। সব মানুষ সমান হয়ে যায়। লালনের এ তত্ত্ব বাঙালির মূল ধর্ম চেতনা যা প্রাচীন অনার্য বাঙালি চেতনাকে প্রতিফলিত করে।

ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালির আচরণ সমন্বয়সূলভ। মধ্যযুগে বাঙালি নতুন কোন ধর্মের উদ্ভাবন ঘটায়নি, সমন্বয় চেয়েছে। বহিরাগত ধর্ম; বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মকে বাঙালি নিজের মত করে গড়ে নিয়েছে, যেখানে পারেনি সেখানে বিদ্রোহ করেছে। বৈষ্ণব, মঙ্গল, সত্য, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্মের উদ্ভব এভাবেই। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন অনার্য ধর্ম চাপা পড়লেও লুপ্ত হয়নি। বাঙালি সংস্কৃতির মূল এই সমন্বয়, সম্প্রীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। বিদ্রোহী ধর্মগুলো টিকেনি বটে, কিন্তু এগুলোর সম্মিলনে যে ভিন্ন একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা তৈরি হয়েছে তা বাঙালি সংস্কৃতির কাণ্ড স্বরূপ। অতএব বাঙালি পর জাতির চিন্তা বা ধর্ম দ্বারা পরিচালিত নয়, পরমতকে সে নিজের মতের সাথে মিশিয়ে নিজের মত গড়ে নিয়েছে। এতে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে অনার্য প্রাকৃতিক ধর্ম ও সাংখ্য, তন্ত্র ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম ও দর্শন। বাংলার নিজস্ব অনার্য দেবদেবীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাঙালি নিজস্ব ধর্ম ও দর্শন দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। সিন্ধুর হিন্দু, আরবের ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের মত বাঙালি অনার্যদেরও একটি ধর্ম ছিল, যা আজ প্রচ্ছন্ন রূপে টিকে আছে এবং অলক্ষ্যে বাংলায় চর্চিত সকল ধর্মকে প্রভাবিত করছে। এ ধর্ম বাঙালির ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়। ইহা বাঙালির আত্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধি ঘটাবে।

তথ্যসূত্র

আবদুল হাই, মুহাম্মদ ও আহমদ শরীফ, ডক্টর। *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪।

ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ। *বাংলার বাউল ও বাউল*। কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৭৮।

দাস, ঋষি। *রামমোহন*। কলিকাতা: অশোক প্রকাশন, ১৯৭২।

নস্কর, দেবব্রত। *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি*। কলকাতা: আনন্দ, ২০১৮।

ফজলে হাসান চৌধুরী, আহমেদ। *নৃবৈজ্ঞানিক প্যারাডাইম রূপান্তরের ধারা*। ঢাকা: ইন্‌ষ্টিটিউট অফ অ্যাপ্লাইড এ্যান্‌থ্রোপলজী, ২০০৩।

ভূষণ কানুনগো, সুনীতি। *বাংলার ইতিহাস প্রাচীন যুগ*। চট্টগ্রাম: ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪।

রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪২০।

শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ১*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৪।

শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য ২*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০১৪।

H. Morgan, Lewis. *Ancient Society*. Chicago: SHARLES H. KERR & COMPANY, 1877.